এক দিন এক ধর্ম সভায়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন "আজকাল একটি কথা চালু হয়ে গেছে, এবং সকলে এই কথাটা স্বীকার করে থাকে যে, পৌত্তলিকতা অন্যায়, আমিও ঐরুপ এক সময়ে ভাবতাম, এবং এর শাস্তি স্বরুপ, আমাকে এমোন এক জনের পদতলে বসে শিক্ষা লাভ করতে হয়েছিল, যিনি পুতুল পূজা হতে সব পেয়েছিলেন। আমি রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কথা বলছি।

শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈরাজি ১৮৩৬ সালের ১৭ঈ ফেব্রূআরি, শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে, বুধবার হুগলি জেলার কামারপুকুর গ্রামে অবতীর্ণ হন। তার পিতা ছিলেন, ক্ষুদিরাম চট্টোপধ্যায়, মাতা চন্দ্রমণী দেবী,

শ্রী রামকৃষ্ণের পার্ষদ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী স্বামী সারদানন্দ তার শ্রী শ্রী লীলাপ্রসংগ গ্রন্থে, অবতার গুরুদেবের আবির্ভাব সম্বন্ধে বলেছেন, "যে দুঃখঃ দারিদ্রে সন্তোষের সরলতা নেই, যে অসচ্ছল সংসারে, নিঃস্বার্থতা ও প্রেম নেই, যে দরিদ্র পিতা মাতার হ্রিদয়ে ত্যাগ পবিত্রতা ও কঠোর মনুষ্বত্তের সহিত কোমল দয়া দাক্ষিণাদি ভাব সমূহের মধুর সামঞ্জস্য নেই, সেই স্থানে কখনো তারা জন্মগ্রহণ করেন না। সংসারের সুখ ভোগের বঞ্চিত দরিদ্র ব্যক্তি ঈশ্বরে ও তাঁহার বিধানকে জীবনের প্রধান অবলম্বন রুপে সর্বদা দৃঢালিংগন করে থাকে, এই যন্ন্য-ই, জগত গুরু মহাপুরুষগণ জন্ম পরিগ্রহন কালে, দরিদ্র পরিবারে ই, আকৃষ্ট হয়ে থাকেন।

গয়ায়ে গদাধর দর্শন করে পুত্র সন্তান লাভ হওয়ায়, মাতা পিতা নাম রেখেছিলেন গদাধর। কিন্তু আদর করে সকলেই গদাই বলে ড়াকতেন, শৈশব ও বাল্য কালে নানা দিব্য ভাব ও সুলক্ষণ দেখা যায় বালকের মধ্যে,

শ্রী শ্রী ঠাকুর নিজে বলেছেন, "সেটা জ্যষ্ঠ কি আষাঢ মাস হবে আমার বয়স ছয় কী সাত বছর, আমি সকালবেলা .. মুড়ি নিএ আলপথে খেতে খেতে যাছি, আকাশে একখানা সুন্দর জলভরা মেঘ উঠেছে, তাই দেখছি আর খাছি, দেখতে দেখতে মেঘখানা আকাশ প্রায় ছেয়ে ফেলেছে, এক ঝাঁক সাদা ...বক ঐ কালো মেঘের কোন দিয়ে উড়ে যেতে লাগল, ...দেখতে দেখতে অপূর্বভাবে তন্ময় হোয়ে এমোন একটা অবস্থা হোলো, যে আর কোনো হুস রো-ইল না। পড়ে গেলুম, ... লোকে ধরাধরি কোরে বাড়ি নিয়ে এসেছিলো, সেই প্রথম ভাবে বেহুশ হোয়ে যাই।"

কিশোর বয়সে শ্রীশ্রী ঠাকুর সাধু সন্যাসী দর্শনে খুব আনন্দিত হোতেন, মাটি দিয়ে নানা দেব দবীর সুন্দর সুন্দর প্রতিমা গড়ে পূজ পুজ খেলা করতেন। জগন্নাথ ক্ষেত্র পূরী যাবার পথে বা পূরী হতে ফিরবার পথে, অনেক সাধু সন্ন্যাসী বৈরাগী কামারপুকুরের রাস্তার ধারে পান্থনিবাসে আশ্রয় নিতেন। আর বালক গদাধর তাদের সান্নিধ লাভ করে, তাদের সংগে মেলা মেশা করে আনন্দে বিভোর হয়ে যেতেন। কোনো দিন সারা গাএ বিভূতি মেখে, কোনো দিন তিলক ধারণ করে, আবার কোনো দিন বা নিজ পরিধেয় বস্ত্র চ্ছিন্ন করে, সাধুদিগের ন্যায় কৌপীন ও বহির্বাস পরে ঘরে ফিরে মাকে দেখাতেন আর বলতেন, "মা আমাকে সাধুরা কেমন সাজিয়ে দিয়াছে দেখ,"

লীলা প্রসংগে উল্লেখ আছে গ্রামের জমিদার লাহা বাবুর বাটিতে, কোনো বিষেশ শ্রাদ্ধ বাসরে এক মহতী পন্ডিত সভা আহূত হয়েছিল এবং পন্ডিত গণ ধর্ম বিষয়ক কোনো জটিল প্রশ্নের সম্মুখে বাদানুবাদ করে করে কোনো সুমীমাংসাএ উপনীত হতে পারছিলন না। বালক গদাধর তখন ঐখানে উপস্থিত হয়ে, ঐ বিষয়ে এমোন সুমীমাংসা করে দিয়াছিলেন, যে পন্ডিত গণ তা শুনে ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। সকলে স্বীকার করেছিলেন, বালকের মধ্যে দৈব শক্তি আছে।

বালক গদাধরের ধাত্রী মাতা ধনী কামারিণী, কামারপুকুরের সকলের অতি প্রিয় গদাধরকে তিনি মায়ের মতন স্নেহ করেন| এই ধাত্রী মাতার তীব্র বাসনা ছিল, উপনয়নের পরে প্রথম ভিক্ষা বালক গদাধর যেমন তার হাত থেকে গ্রহণ করেন। বালক গদাধর ধনী কামারিণীকে কথা দিয়েছিলেন, প্রথম ভিক্ষা তিনি তাঁর হাথ থেকে গ্রহণ কোরবেন। অনেকে তীব্র আপত্তি জানালেন, কিন্তু কোনো ফল হোলোনা এই ভাবে শ্রীশ্রী ঠাকুর প্রচলিত সামাজিক প্রথার উর্দ্ধে উঠে প্রমাণ করেছিলেন, ঈশ্বর অনেক বড়। তার কাছে সব মানুষ–ই সমান। বড় জাত ছোট জাত বলে তার কাছে কিছু তফাত নেই।

উপনয়নের পরে অগ্রজ শ্রী রামকুমার চট্টোপাধ্যায় নিজ প্রতিষ্ঠিত টোলে সংস্কৃত অধ্যয়নের জন্য গদাধর কে সংগে করে কোলকাতাএ ঝামাপুকুর পল্লীতে নিএ এলেন। তিনি যথেষ্ঠ যত্ন নিলেন। কিন্তু সংস্কৃত অধ্যয়নে গদাধর মনোয়োগ দিতে চাইলেন না।

কলকাতার দক্ষিণাংশে জানবাজার অঞ্চল, এখানে রাণী রাসমণীর বাটি, তিনি প্রভূত সম্পত্তির মালিক। তার স্বামীর মৃত্যুর পরে, বিষয় সম্পত্তির দেখাশোনার ভার তিনি নেজে নিএছিলেন। একবার রাণী মা অন্নপূর্ণা ও বাবা বিশ্বনাথের পূজা মানসে কাশী যাত্রা স্থির করেন। যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব রাত্রে

তিনি দেবীর দর্শন ও প্রত্যাদেশ লাভ করেন। এই প্রত্যাদেশ শিরধার্য্য করে, ভাগীরথী তীরে দক্ষিণেশ্বরে বিস্তীর্ণ এক ভূখন্ড ক্রয় করে, তিনি বহু অর্থ ব্যয় করে সেখানে শ্রী শ্রী জগদম্বা, মা ভবতারিণীর অপূর্ব এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন। রাণীর একান্ত প্রার্থনাএ ও তার ভক্তি ও আকুতিতে মুগ্ধ হয়ে শ্রী রামকুমার চট্টপাধ্যায় দেবীর পূজাএ ব্রতী হলেন। তাই অগ্রজর সংগে গদাধরও গংগা তীরে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে থাকতে লাগলেন। রাণীর কনিষ্ঠ জামাতা মথুর মোহন বিশ্বাসের উপর, রাণী তার সমস্ত বিষয় সম্পত্তির দেখা শোণার ভার দিএছিলেন।

মথুর বাবু বিষয়ী ও ভক্তিমান লোক ছিলেন। মথুর বাবুর বিষেশ আগ্রহে ঠাকুর মা ভবতারিণীর পূজর কাজে ব্রতী হলেন। আবার ভগবত প্রেমে বিভোর শ্রী শ্রী ঠাকুর শ্যামা মায়ের পূজএ আত্মহারা হএ পড়লেন।

ঠাকুর মন প্রাণ ঢেলে মধুর সুরে গান গাইতেন। মা মা বলে ড়াকতে ড়াকতে ঠাকুর তন্ময় হোএ পড়তেন। ভাগীরথী তীরে মন্দির সংলগ্ন পঞ্চবটী অঞ্চল তখন জংগলে পরিপূর্ণ। ঠাকুর ঐ জংগলে একাকী প্রবেশ করে এক আমলকী তলাএ বসে গভীর ধ্যানে মগ্ন হএথাকতেন।

ঠাকুরের ভক্তি ও পূজাএ মৃণময়ী শ্যামা–মা চিন্ময়ী রূপে শ্রী শ্রী ঠাকুরকে দর্শন দিলেন। ঠাকুরের কাছে মা ছিলেন জাগ্রতা দেবী।

সাধনার অবস্থায়ে ঠাকুর অনেক দিন, মা মা বলে কাঁদতে কাঁদতে গংগার তীরে গড়াগড়ি দিতেন। কখোন বা পাগলের ন্যায় ভাবে বিভোর হএ, মার সংগে কথা বলতেন|

সাধন কালে প্রথম চার বছরে ইশ্বর দর্শনের জন্য, অন্তরের ব্যাকুল আগ্রহেই, ঠাকুরের প্রধান অবলম্বন ছিল, কেবল মাত্র উহার সহায়ে, ঠাকুরের জগদম্বা দর্শন লাভ হওআয়, এটি প্রমাণিত হএ, যে বায্য কোন বিষয়ের সহায়তা না পেলেও, একমাত্র ব্যাকুলতা থাকলে, সাধকের ইশ্বর লাভ হতে পারে,

সাধিকা তান্ত্রীক ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কাছে ঠাকুর তন্ত্র মতে দীক্ষা নিলেন, ক্রমে ক্রমে, তার নির্দেশে অচিরেই তন্ত্র সাধনাএ সিদ্ধি লাভ করলেন, শিষ্যের চরম উপলব্ধি স্বচক্ষে দেখে, ব্রাহ্মণী দৃঢনিশ্চয় হলেন, যে ঠাকুর অবতার পুরূষ, নর রূপে স্বয়ং নারায়ণ।

কিছুদিনের মধ্যেই, তোতাপুরী নামে একজন বেদান্ত বাদী সন্যাসী দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হলেন, জগন্মাতার অনুমতি নিয়ে ঠাকুর নির্গুণ নিরাকার সাধনায়ে রত হলেন, তোতাপুরীর কাছে গোপনে সন্যাস নিলেন।

স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ বলেন, ঠাকুর বলতেন ধ্যান করতে বসে, চেষ্টা করেও মনকে নির্বিকল্প করতে বা নাম রূপের গন্ডি অতিক্রম করতে পারলাম না, অন্য বিষয় হতে মন সহজে গুটতে পেরেছিল, কিন্তু শ্রী শ্রী জগদম্বার চিরপরিচিত, চিদঘন উজ্জ্বল মূর্তি জ্বলন্ত জীবন্ত ভাবে উদিত হয়ে, সর্বপ্রকার নাম রূপ ত্যাগের কথা ভুলাতে লাগল, সিদ্ধান্ত বাক্য সকল শ্রবণ পূর্বক ধ্যানে বসে জখন পরপর তিন দিন ঐরূপ হতে লাগল, তখন নির্বিকল্প সমাধি সম্বন্ধে এক প্রকার নিরাশ হোলাম, এবং চোখ খুলে তোতাকে বললাম, ...হলনা, মনকে সংপূর্ণ নির্বিকল্প করে আত্মধ্যানে মগ্ন হতে পারছিনা,

ন্যাংটা তখন বিষম উত্তেজিত হয়ে তিরস্কার করে বলল, ক্যুঁ হোগা নেহি, কি, হবে না, এত বড় কথা বলে, কুটীরের মধ্যে ইতস্তত নিরীক্ষণ করে, একটি ভগ্ন কাঁচ পেয়ে, তার সূচের ন্যায় তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ, ঠাকুরের ভ্রূমধ্যে সজোরে বিদ্ধ করে বলল, ...এই বিন্দুতে মনকে গুটিএ আন, তখন পুনরায় দৃঢ় সংকল্প করে ধ্যানে বসলাম, এবং জগদম্বার শ্রী মূর্তিকে মনে উদয় হবার মাত্র, জ্ঞানকে অসী কল্পনা করে ওর দ্বারা, ঐ মূর্তিকে মনে মনে দ্বিখন্ড করে ফেললাম, তখন আর মনে কোন, বিকল্প থাকল না, একেবারে হু হু করে সমগ্র নাম রূপ রাজ্যের উপরে উঠে গেল, এবং সমাধিমগ্ন হলাম।

একবার ফলহারীণি কালীপূজার গভীর রাত্রে, নিজ সহধর্মীণিকে ষোড়শী রুপে পূজা করলেন, নিজের জপের মালা, সাধনার ফল আদিকে দেবীর পাদপদ্মে সমর্পণ করলেন, শ্রী শ্রী সারদা দেবীকে ষোড়শী রুপে পূজা করে নারীত্বের চরম সার্থকতা, সেই পবিত্র মাতৃভাটিকে জগতের কাছে তুলেধরলেন ।

শ্রীমত শংকরাচার্য একটি শ্লোকে বলেছেন, শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি, য়দুক্তং গ্রন্থ কোটিভিঃ, ব্রহ্ম সত্যং জগত মিথ্যা, জীবঃ ব্রহ্মৈব না পরঃ। ব্রহ্ম সত্য জগত মিথ্যা জীব ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নয়ে, শ্রী শ্রী ঠাকুররে সেই একি অনুভূতি, একি উক্তি, জীব ই শিব, শিবকে দয়া কিরে, শিব জ্ঞানে জীবের সেবা কর।

ভগবান আছেন কি না এই প্রশ্নের উত্তরে, ঠাকুর নরেন কে বললেন, তোমাদের যেমন দেখছি, যেমন কথা বলছি, এই রূপে ইশ্বরকে দেখাযায় ও তার সংগে কথা বলাযায়, কিন্তু ঐ রুপ করতে চায়

কে, লোকে স্ত্রী পুত্রের শোকে ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলে, বিষয় বা টাকার জন্য তদ্রুপ করে, কিন্তু ইশ্বরকে পেলাম না বলে, ঐ রুপ কে করে, তাকে পেলাম না বলে যদি ঐ রুপ ব্যাকুল হয়ে কেউ তাকে ড়াকে, তাহলে তিনি নিশ্চয় তাকে দেখা দেন, এই কথা শুনে নরেনের মনেহয়েছিল, তিনি অপর ধর্মপ্রচারকদের মত, কল্পনা বা রূপকের সাহাযে ঐ রূপ বলছেন না। সত্য সত্য-ই সর্বস্ব ত্যাগ করে এবং সম্পূর্ণ মনে ইশ্বরকে ড়েকে, যা প্রত্যক্ষ দেখেছেন,

মাস্টার প্রশ্ন করেন, ইশ্বরকে কি দর্শন করা যায় ? শ্রী রামকৃষ্ণ বললেন দেখা অবশ্য-ই যায়, মাঝে মাঝে নির্জনে বাস, তার নাম গুনগান, বস্তু বিচার, এই সব উপায় অবলম্বন করতে হয়, ...ব্যাকুল হয় কাঁদলে তাকে দেখাযায়, মাগ, ছেলের যন্য লোকে এক ঘটি কাঁদে, টাকার যন্য কেঁদে ভাসিয়েদেয়, কিন্তু ইশ্বরের জন্য কে কাঁদছে, ড়াকার মত ড়াকতে হয়, ব্যাকুলতা হলেই অরুণোদয় হয়, তারপর সূর্য দেখা দেবেন, ব্যাকুলতা পরেই, ইশ্বর দর্শন, তিন টান একত্র হলে, তবে তিনি দেখা দেন, বিষয়ির বিষয়ের উপর, মায়ের সন্তানের উপর, আর সতীর পতীর উপর টান, এই তিন টান একত্র হলে, যদি কারো এক সংগেই হয়, সেই টানের জোরে ইশ্বর লাভ করতে পারে।

বৈদ্যনাথ নামে এক ভক্ত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, মহাশয় আমার এক সংদেহ আমার আছে, এই যে লোকে বলে ফ্রি উইল, অর্থাত স্বাধীন ইচ্ছা, মনে করলে ভাল কাজ করতে পারি মন্দ কাজও করতে পারি, এটা কি সত্য, ...সত্য সত্য কি আমরা স্বাধীন, শ্রী রামকৃষ্ণ বললেন, সকল-ই ইশ্বরাধীন, তার-ই লীলা, তিনি নানা জিনিস করেছেন, ছোট বড়, বলবান দুর্বল, ভাল মন্দ, ও সব তার মায়ার খেলা, যতখন ইশ্বরকে লাভ না হয়, ততখন আমাদের মনে হয় আমরা স্বাধীন, এ ভ্রম তিনি

রেখেদেন, তা ন হলে পাপের বৃদ্ধি হত, পাপকে ভয় হত না, পাপের শাস্তি হত না, যিনি ইশ্বর লাভ করেছেন তার ভাব কি জান, আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর, তুমি ঘরণী, আমি রথ, তুমি রথী, যেমন চালাও তেমনি চলি, যেমন বলাও তেমনি বলি।

মৃত্যুর পর কি হয়, এক জন মাড়োয়ারী ভক্ত জিগেস করলেন, ঠাকুর বললেন, গীতার মতে মরবার সময় যা ভাববে তাই হবে, ভরত রাজা হরিণের কথা ভেবে ভেবে হরিণ হয়েছিল, তাই ইশ্বরকে লাভ করবার যন্য সাধন করা চাই, রাত দিন তার চিন্তা করলে মরবার সময়েও, সেই চিন্তা আসবে

অনেকের ISHWAR লাভ করতে এত দেরী হয় কেন, ঠাকুর বললেন, ভোগ আর কর্ম শেষ না হলে ব্যাকুলতা আসে না, বৈদ্য বলে, ...দিন কাটুক, সামান্য ওষুধে উপকার হবে, নারদ রামকে বললেন রাম, তুমি অযোধ্যায় বসে র–ইলে রাবণ বধ কি করে হবে, তুমি যে সেইজন্য অবতীর্ণ হয়েছ, ...রাম বললেন, নারদ সময় হোক, রাবণের কর্ম ক্ষয় হোক, তবে তার বধের উদযোগ হবে।

সংসারে এত দুঃখ কেন, ...এ সংসার ত তার লীলা, লীলা খেলার মত, এ লীলাএ সুখ দুঃখ পাপ পূণ্য জ্ঞান অজ্ঞান ভাল মন্দ, সব–ই আছে, দুঃখ পাপ এসব গেলে, লীলা ত চলে না, চোর চোর খেলাএ বুড়িকে ছুঁতে হয়ে, খেলার গোড়াতে বুড়িকে ছুঁলে সন্তুষ্টি হয় না, ইশ্বর বুড়ির ইচ্ছে যে খেলাটা খানিকটা যেন চলে।

অর্থ বৃদ্ধির চেষ্টা করা কি উচিত ? ....বিদ্যার সংসারের জন্য পারাযায়, বেশী উপায়ের চেষ্টা করবে, কিন্তু সদুপায়, উপার্জন করা উদ্দেশ্য নয়, ইশ্বরের সেবা করা–ই উদ্দেশ্য, টাকাতে যদি ইশ্বরের সেবা হয়, তবে সে টাকায়ে দোষ নেই।

ইশ্বর দুবার হাঁসেন, একবার হাঁসেন যখন দুই ভাই জমি বখরা করে, দড়ি বেঁধে বলে, এদিক টা আমার, ও দিক টা তোমার, ইশ্বর তখন এই ভেবে হাঁসেন, ...আমার জগত, আর খানিকটা মাটি নিয়ে বলছে, অমার এদিক, আর ওদিক টা তোমার, ইশ্বর আর একবার হাঁসেন, ছেলের সংকটাপর্ণ অসুখ, মা কাঁদছে, বৈদ্য এসে বলছে ভয় কি মা, আমি ভাল করব, বৈদ্য জানেনা ইশ্বর যদি মারেন, কার সাধ্য নেই রক্ষা করে।

সংসারে থেকেও ভগবানকে পাওয়া যায়, সংসারে থাকবে বড়্লোকের ঘরের দাসীর মত, দাসী যেমন মনীবের ছেলেমেয়েদের মানুষ করে, নিজের ছেলে পুলের মত যত্ন করে, বলে আমার রাম, আমার হরি, কিন্তু মন টা পড়ে থাকে দেশের বাড়িতে, নিজের ছেলেমেয়েদের ওপর, সংসারে থাক তাতে দোষ নেই, সংসার তোমাতে না থাকলে–ই হোল, জলের ওপর নৌক থাকতে পারে, কিন্তু নৌকয়ে জল ঢুকলেই নৌক ডুবে যাবে, সংসারে থাকবে পাঁকাল মাছের মত, পাঁকাল মাছ যেমন পাঁকে থাকে কিন্তু গাএ পাঁক লাগে না।

কলীযুগে পক্ষে ভক্তি যোগ সহজ পথ, ভক্তি যোগ–ই যুগ ধর্ম, কর্ম যোগ বড় কঠিন, শাস্ত্রে যে সমস্ত কর্ম করতে বলেছে তার সময় কো–ই, কলিতে আয়ু কম, তার পর অনাসক্ত হয়ে ফলকামনা না করে কর্ম করা ভারী কঠিন, ইশ্বর লাভ না করলে, ঠিক অনাসক্ত হওআ যাএ না।